CC-8

উপন্যাস-খ

ক্লাস নোটস- G.G (২০২০ এপ্রিল)

মহাশ্বেতা দেবী

১৪ জানুয়ারি ১৯২৬ – ২৮ জুলাই ২০১৬

ভুমিকা :- মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন একজন সাহিত্যিক ও মানবাধিকার আন্দোলন কর্মী।

জন্ম:- ১৪ জানুয়ারি ১৯২৬

মৃত্যু :- ২৮ জুলাই ২০১৬

পিতা :- মনীষ ঘটক

মাতা :- ধরিত্রী দেবী

স্বামী :- বিজন ভট্টাচার্য

পুত্র :- নবারুণ ভট্টাচার্য

আত্মপ্রকাশ :-

মহাশ্বেতা দেবী : ১৯৩৯ সালে খগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত "রংমশাল" পত্রিকায় "রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা" গ্রন্থ বিষয়ে রচনার মাধ্যমে লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম আত্মপ্রকাশ।
এরপর রংমশাল" পত্রিকায় তাঁর "ছেলে ভুলানো ছড়া" নামক কবিতা প্রকাশিত হয়।

প্রথম প্রকাশিত :-

দেশ পত্রিকায় তাঁর প্রথম জীবনীগ্রন্থ ঝাঁসীর রাণী ৬ আগস্ট ১৯৫৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১৯৫৬ সালে পুস্তকাকারে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় নিউ এজ প্রকাশনা সংস্থা থেকে।
দেশ পত্রিকাতেই 'যশবমত্মী' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে।

এর আগে ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬-এর মধ্যে শ্রীসুমিত্রা দেবী/ শ্রীমতী সুমিত্রা দেবী ও সুমিত্রা দেবী ছদ্মনামে তিনি অনেক গল্প লেখেন সচিত্র ভারতী পত্রিকায়।

ইতিহাস-আশ্রিত জীবনীগ্রন্থ ঝাঁসীর রাণী সাহিত্যিক হিসেবে মহাশ্বেতার অবস্থানকে একটি শক্ত ভিত্তি দেয়। সেই ভিত্তিতেই তাঁর পরবর্তী জীবনের সুউচ্চ সাহিত্য-পিরামিড স্থাপিত।
১৯৫৭ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস নটীর পটভূমি ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ; এ-বিদ্রোহের ঝঞ্ঝাসংকুল পটে খোদাবক্স ও মোতির প্রণয়ের আখ্যানে নটী ঐতিহাসিক উপন্যাসের শর্তপূরণ করেছে। মহাবিদ্রোহের পটভূমিতে এ-সময় তিনি আরো লিখেছেন উপন্যাস অমৃত সঞ্চয়ন (১৯৬২) ও গল্প 'চম্পা' (১৯৫৯); আঠারো শতকের বর্গি আক্রমণকে উপজীব্য করেছেন আঁধার মানিক (১৯৬৬)উপন্যাসে। এ-কাহিনিগুলোতে তিনি আঠারো ও উনিশ শতকের বিদ্রোহ ও সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনকে একবিন্দুতে মিলিয়েছেন।

১৯৭৯ সালে পিতার মৃত্যুর পর মণীশ ঘটক-সম্পাদিত বর্তিকা পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মহাশ্বেতা এবং এ-পত্রিকাকে পরিণত করেন ক্ষুদ্র কৃষক, কৃষিমজুর, আদিবাসী, শিল্প-শ্রমিক তথা সমাজের ব্রাত্য শ্রেণির মুখপত্রে।

১৯৮২-৮৪ সালে তিনি যুগান্তরে ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন কলেজ থেকে দুই বছরের ছুটি নিয়ে; আদিবাসী এবং ব্রাত্য শ্রেণির মানুষের জীবনসংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে তাদের প্রতি সহমর্মিতা ও ভালোবাসায় সাহিত্যের আসরে উপস্থাপিত করেন সে-জীবনকে।

ছোট গল্প :-

_____

১)দ্রৌপদী:-

_____

প্রথম প্রকাশিত হয় :- "শারদীয় পরিচয়" পত্রিকায় ১৯৭৭ সালে ।

পরে গল্পটি স্থান পায় :- "অগ্নিগর্ভ" গল্পগ্রন্থে ।

'দ্রৌপদী' (১৯৭৭) রচনার মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতা এক অবিস্মরণীয় আদিবাসী নকশাল নারীচরিত্র গড়ে তোলেন। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে গল্পটির কাহিনি বিসত্মৃত হয়েছে এবং একই সঙ্গে আদিবাসীদের জীবনের নানা বঞ্চনা ও সংস্কার এবং গৌরবের প্রান্ত কাহিনি-সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নারীর চিরন্তন দুর্বলতা নগ্নতাকে শক্তি হিসেবে, বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এ-গল্পে। বিষয়বিন্যাসে, ভাষার সূক্ষ্ম বয়নে এবং এক্সপ্রেশনে 'দ্রৌপদী' সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার।

২)জাতুধান :- ৩)সাঁঝসকালের মা:-

_____

২)জাতুধান গল্পটি প্রকাশিত হয় :-১৯৭৮ সালে । ("অজ্ঞাত" পত্রিকায় প্রথম)পরে আবার

"বর্তিকা" পত্রিকার পুনমুদ্রিত হয় ।

৩)'সাঁঝ সকালের মা' --- মহাশ্বেতা দেবী। এটি "মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন" (এতে ৯টি গল্প আছে। এটি ১৯৯৩ সালে "ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট" থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

জীবনের দাবির কাছে ধর্মীয় কিংবা সামাজিক সংস্কারের পরাজয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'জাতুধান' গল্পের সাজুয়া ও 'সাঁঝসকালের মা' গল্পের সাধন উভয়েই ভাত অমত্মঃপ্রাণ।

বন্যায় সাজুয়ার মৃত্যু হয়েছে ভেবে সকলে তার শ্রাদ্ধের জন্য যে চাল দেয়, জীবিতাবস্থায় ফিরে সে চালের বস্তা কাঁধে নিয়ে অন্ধকারে পালায়। আর সাধন ঘরে ফেরে তার মায়ের শ্রাদ্ধের চাল নিয়ে, ভাতের গন্ধে সে মাকে অনুভব করতে চায়। নিরন্ন মানুষের স্বপ্ন-সাধের এমন সামান্যতার বিবরণে লেখক প্রতিমুহূর্তে পাঠককে কেবল চমকিত করেন না, বরং তাদের তাড়িত করেন প্রবল দায়বোধে।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি

- *ঝাঁসির রানি* (১৯৫৬, জীবনী)
    - *দ্য কুইন অফ ঝাঁসি*, মহাশ্বেতা দেবী (সাগরী ও মন্দিরা সেনগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত)। এই বইটি হল রানি লক্ষ্মীবাইয়ের জীবনীগ্রন্থ। ঐতিহাসিক নথিপথ (প্রধানত রানির পৌত্র জি. সি. তাম্বে কর্তৃক সংগৃহীত) এবং লোককথা, কাব্য ও মুখে মুখে প্রচলিত কিংবদন্তিগুলি নিয়ে গবেষণার পর বইটি রচিত হয়। মূল বাংলা বইটি ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। ইংরেজি অনুবাদটি ২০০০ সালে সিগাল বুকস, ক্যালকাটা থেকে প্রকাশিত হয়।
- *হাজার চুরাশির মা* (১৯৭৪, উপন্যাস)

- *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৯, উপন্যাস)
- *অগ্নিগর্ভ* (১৯৭৮, ছোটোগল্প সংকলন)
- *মূর্তি* (১৯৭৯, ছোটোগল্প সংকলন)
- *নীড়েতে মেঘ* (১৯৭৯, ছোটোগল্প সংকলন)
- *স্তন্যদায়িনী* (১৯৮০, ছোটোগল্প সংকলন)
- *চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর* (১৯৮০, ছোটোগল্প সংকলন)

চলচ্চিত্রায়ন

সংঘর্ষ (১৯৬৮), *লায়লি আসমানের আয়না* ছোটোগল্পটি অবলম্বনে নির্মিত হিন্দি চলচ্চিত্র।[২৬]

- *রুদালি* (১৯৯৩)[২৭]
- *হাজার চৌরাসি কি মা* (১৯৯৮)
- *মাটি মায়* (২০০৬),' 'দায়েঁ *ছোটোগল্পটি অবলম্বনে নির্মিত মারাঠি চলচ্চিত্র।*
- *গাঙ্গোর* (২০১০), *চোলি কে পিছে* ছোটোগল্পটি অবলম্বনে নির্মিত ইতালীয় চলচ্চিত্র
  - **সাহিত্যকর্ম**
  - মহাশ্বেতা দেবী ১০০টিরও বেশি উপন্যাস এবং ২০টিরও বেশি ছোটোগল্প সংকলন রচনা করেছেন। তিনি মূলত বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। তবে সেই সব রচনার মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে।[৯] তার প্রথম উপন্যাস *ঝাঁসির রানি* ঝাঁসির রানির (লক্ষ্মীবাই) জীবনী অবলম্বনে রচিত। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে। এই উপন্যাসটি রচনার আগে তিনি ঝাঁসি অঞ্চলে গিয়ে তার রচনার উপাদান হিসেবে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে তথ্য ও লোকগীতি সংগ্রহ করে এনেছিলেন।[৩]
  - ১৯৬৪ সালে মহাশ্বেতা দেবী বিজয়গড় কলেজে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত কলেজ) শিক্ষকতা শুরু করেন। সেই সময় বিজয়গড় কলেজ ছিল শ্রমিক শ্রেণির ছাত্রীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই সময় মহাশ্বেতা দেবী একজন সাংবাদিক ও একজন সৃজনশীল লেখক হিসেবেও কাজ চালিয়ে যান। তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোধা ও শবর উপজাতি, নারী ও দলিতদের নিয়ে পড়াশোনা করেন। তার প্রসারিত কথাসাহিত্যে তিনি প্রায়শই ক্ষমতাশালী জমিদার, মহাজন ও দুর্নীতিগ্রস্থ সরকারি আধিকারিকদের হাতে উপজাতি ও অস্পৃশ্য সমাজের অকথ্য নির্যাতনের চিত্র অঙ্কন করেছেন।[৭] তার অনুপ্রেরণার উৎস সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> “ আমি সর্বদাই বিশ্বাস করি যে, সত্যকারের ইতিহাস সাধারণ মানুষের দ্বারা রচিত হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সাধারণ মানুষ যে লোককথা, লোকগীতি, উপকথা ও কিংবদন্তিগুলি বিভিন্ন আকারে বহন করে চলেছে, তার পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে আমি ক্রমাগত পরিচিত হয়ে এসেছি। ... আমার লেখার কারণ ও অনুপ্রেরণা হল সেই মানুষগুলি যাদের পদদলিত করা হয় ও ব্যবহার করা হয়, অথচ যারা হার মানে না। আমার কাছে লেখার উপাদানের অফুরন্ত উৎসটি হল এই আশ্চর্য মহৎ ব্যক্তিরা, এই অত্যাচারিত মানুষগুলি। অন্য কোথাও আমি কাঁচামালের সন্ধান করতে যাব কেন, যখন আমি তাদের জানতে শুরু করেছি? মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার লেখাগুলি আসলে তাদেরই হাতে লেখা। ”

  - উত্তর-ঔপনিবেশিক গবেষক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করে তিনটি গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। এগুলি হল *ইম্যাজিনারি ম্যাপস* (১৯৯৫, রুটলেজ), *ওল্ড ওম্যান* (১৯৯৭, সিগাল) ও *দ্য ব্রেস্ট স্টোরিজ* (১৯৯৭, সিগাল)
-

আলোচনা ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা।

বিষয়ের বহুমাত্রিকতা ও দেশজ আখ্যানের অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন মহাশ্বেতা দেবী। তিনি ইতিহাস ও রাজনীতি থেকে যে উপন্যাস রচনা শুরু করেন, সেখানে যেমন ঝাঁসির রানীর মতো চরিত্র রয়েছে তেমনি রয়েছে সার্কাসের শিল্পী ও নৃত্যশিল্পীদের আখ্যান। তার শুরুর দিকের উপন্যাস ঝাঁসির রানী (১৯৫৬), মধুরে মধুরে (১৯৫৮), প্রেমতারা (১৯৫৯), আঁধার মানিক (১৯৬৬), বায়স্কোপের বাক্স (১৯৬৪)সহ প্রভৃতিতে নানা শ্রেণির জীবনের উপস্থিতি পাওয়া যায়। তবে তার সবচেয়ে আলোচিত রাজনৈতিক উপন্যাস হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪), এই উপন্যাসকে তার সাহিত্যের বাঁক পরিবর্তনের সূচনা বলে মনে করা হয়। এটা তার দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাকাল। এ সময় তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো : হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪), ঘরে ফেরা (১৯৭৯), তিতুমীর (১৯৮৪), স্বেচ্ছা সৈনিক (১৯৮৬), অক্লান্ত কৌরব (১৯৮২), বিবেক বিদায় পালা (১৯৮৩), বন্দোবস্তি (১৯৮৮), মার্ডারারে মা (১৯৯২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এরপর তিনি ইতিহাস অনুসন্ধানে চলে গেলেন একেবারে প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছে। ইতিহাস, রাজনীতি ও উপকথাকে কেন্দ্র করে যে উপন্যাস লেখা শুরু করেন, তা সভ্য সমাজের মানুষের বিচরণের বাইরের জগৎ। সত্তরের মাঝামাঝি সময়ে তার উপন্যাসকে নিয়ে গেলেন একেবারে অন্য আলোয়, যা তার উপন্যাস রচনার তৃতীয় পর্যায় হিসেবে ধরা যায়। সেই পথে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী একের পর এক উপন্যাস রচনা করে স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করেন। তিনি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক ভৌগোলিক পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিবর্তনের ধারায় সে দেশীয় আদিবাসী জীবনের পরিবর্তন বর্ণনা করেন। পাহাড়ি অরণ্য জীবনের সঙ্গে উপন্যাসে ফুটে উঠে পরিবেশের বিপন্নতার চিত্র, যা আজকের পৃথিবীকেও বিচলিত করে, সেই আখ্যান সাহিত্যে রূপ দিয়ে আদিবাসী জীবনে ঘটে যাওয়া উলগুলান (১৯০০), কোলহান (১৮৩৫) এবং হুল (১৮৫৫-৫৬) সম্পর্কে পাঠক মনে সাড়া জাগান মহাশ্বেতা দেবী। তার আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু (১৯৬৭), অরণ্যের অধিকার (১৯৭৫), চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তির (১৯৮০), সুরজ গাগরাই (১৯৮৩), স্বেচ্ছাসৈনিক (১৯৮৫), টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা (১৯৮৭), বন্দোবস্তী (১৯৮৯), ক্ষুধা (১৯৯২), কৈবর্ত খণ্ড (১৯৯৪) প্রভৃতি। এছাড়া অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের প্রেক্ষিতেই কিশোরদের জন্য বিরসা মুণ্ডা (১৯৮১) নামের একটি উপন্যাসও লিখেন। উল্লেখ্য, উপন্যাসগুলো রচনার ক্ষেত্রে রয়েছে বিষয়বস্তু এবং প্রকরণগত বিশিষ্টতা।

অরণ্যচারী জনগোষ্ঠীর মুখে মুখে ঘুরে ফেরা জীবন ও ঐতিহ্য থেকে সেই জাতিসত্তার যে ইতিহাস তিনি রচনা করেন, তা বঙ্কিমচন্দ্রের দেখানো পথে বা ভাবধারায়ও নয়, একেবারে তার নিজের মতো করে প্রকাশ। মহাশ্বেতা অন্ত্যজ আদিবাসীদের চোখ দিয়ে জীবনকে ব্যাখ্যা করেন। এসব উপন্যাসে প্রধান চরিত্রগুলো এসেছে আদিবাসী সমাজ থেকে। বিভূতিভূষণ যেমন তার 'আরণ্যক' উপন্যাসটিতে অরণ্যচারী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা এনেছিলেন। যা ছিল একজন কলকাতার বাবুর চোখ থেকে দেখা। সেখানে মুগ্ধতা আর করুণার চোখে নির্মিত হয়েছিল প্রেক্ষাপট। কিন্তু মহাশ্বেতার অরণ্যের অধিকারের কথা সেই সমাজের জীবনাপোলব্ধি। তাদের বাঁচার অধিকার থেকে তুলে আনা প্রেক্ষাপট। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অরণ্যবহ্নি (১৯৬৬) ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর নায়ক সিধু-কানুর কৌমচেতনা ও দেশচেতনায় উজ্জীবিত উপন্যাস। সত্যেন সেনের বিদ্রোহী কৈবর্ত (১৯৬৯) উপন্যাসটি পাল যুগে উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলের শূদ্রস্থানীয় কৈবর্ত বিদ্রোহ নিয়ে রচিত। অবহেলিত কৈবর্ত বিদ্রোহ নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীও একটি উপন্যাস রচনা করেছেন, কৈবর্ত খণ্ড (১৯৯৪) নামে। সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) রচিত মহাকালের রথের ঘোড়া (১৯৭৭) যা আদিবাসী জীবনঘনিষ্ঠ উপন্যাস। চল্লিশের দশকের কথকার সাবিত্রী রায় (১৯১৮-১৯৮৫) তার পাকা ধানের গান (১ম পর্ব ১৯৫৬, ২য় পর্ব ১৯৫৭ এবং ৩য় পর্ব ১৯৬৫ সালে) লিখেন। যেখানে তিনি হাজং অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষিত নিয়ে আসেন ।

মহাশ্বেতা দেবীর বিশিষ্টতা তিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তার কাছে সাহিত্য শুধু বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ নয়, বরং সাহিত্যও শ্রমসাধ্য বিষয়। মহাশ্বেতার কলমের কালি বুলেটের মতো সমাজকে বিদ্ধ করে। ধীমান দাশগুপ্ত মহাশ্বেতার সাহিত্যকৃতির নান্দনিক তাত্পর্য ব্যাখ্যায় বলেন— মহাশ্বেতার সাহিত্যিক ক্ষেত্রটিকে, বলা যায়, মানিকের রিয়ালিজম, সতীনাথের ফর্ম্যালিজম এবং তারাশঙ্করের এক্সপ্রেশনিজমের এক একীভূত ক্ষেত্র। আমার বিচারে মানিক বা তারাশঙ্করের চেয়েও সতীনাথের সঙ্গে মহাশ্বেতার আত্মীয়তা যেন অধিক।... সতীনাথের মতোই মহাশ্বেতাও 'শ্রেণিবিভক্ত বর্ণবিচ্ছুরিত যৌনতাশাসিত ধর্মসাপেক্ষ প্রাদেশিকতা-নির্ভর' এক ভারতবর্ষের লেখক।

বাংলা সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবীকে নিছক সমাজতাত্ত্বিক নয় বরং সমাজ মনস্তাত্ত্বিক বলা যেতে পারে। এক স্বতন্ত্র ঘরানার লেখক তিনি। বলা যায় পোস্টমডার্নিজমের ক্ষেত্রে সাব-অলটার্ন আসার আগে থেকেই মহাশ্বেতা সাহিত্যে নিজের মতো করে সাব-অলটার্ন চর্চা করে গেছেন। অনেক বেশি শিকড়ে গিয়েই তিনি অরণ্যের অধিকার লিখেছেন, তা প্রমাণিত হয় যখন তিনি আদিবাসী মুণ্ডা সমাজের ঘরের লোক হয়ে ওঠেন। সেই আদিবাসী সমাজ তাকে 'মারাং দাই' বলে স্বীকার করে নেয়। মহাশ্বেতা দেবী কাজের প্রতি এতই সচেতন থেকেছেন যে তিনি আদিবাসী সংস্কৃতির ইতিহাসের মাধ্যমে তথা তাদের লোকগাথা, উপকথা, মিথকে কেন্দ্র করে যে জীবন ও সংগ্রামকে তুলে ধরে উপন্যাস লিখেছেন, তা মোটেও আরোপিত হয়ে ওঠে না বরং জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে যায়। এভাবে সত্তুরের দশকের পর তিনি পুরোপুরিভাবে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এসটাবলিশমেন্ট-বিরোধী হয়ে ওঠেন।

মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ঘটনার নাটকীয়তার চেয়ে মানব-চরিত্রের দিকে বিশেষ মনোযোগ তিনি দিয়েছেন। তার উপন্যাসের বেশিরভাগ প্রধান চরিত্রগুলো আদিবাসী শ্রেণি থেকে উঠে আসা মানুষ। অরণ্যের অধিকার এ বীরসা মুণ্ডা, ধানী মুণ্ডা, সুগানা, করমি, কোমতা, সালী ও ডোনকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর উপন্যাসটিতে চোট্টি মুণ্ডা, ধানী মুণ্ডা, দুখিয়া, হরমু, পাহানসহ অসংখ্য চরিত্র মুণ্ডা জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। এছাড়া কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু-তে কবি বন্দ্যঘটী গাঞি, সুরজ গাগরাই-এর সুরজ গাগরাই, নান্দি কালু সুমরাই প্রমুখ কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলো আদিবাসী মানুষ। তবে টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায়ও পিরথা-এর প্রধান চরিত্র এনেছেন নিম্ন মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি, অন্যদিকে বিখিয়সহ বেশ কিছু চরিত্র আদিবাসী। তার চরিত্রেরা আদিভারতীয় অধিবাসী, নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।

মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসে অসংখ্য বীরের কাহিনী তুলে এনেছেন। এই বীরের কাহিনী শুধু বীরসা চরিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এছাড়াও আরও বীর চরিত্র আমরা পেয়েছি। যেমন— চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর-এর চোট্টি একজন বীর তীরন্দাজ। সুরজ গাগরাই-এর সুরজ চরিত্রটিতেও বীরের উপস্থিতি দেখতে পাই। মহাশ্বেতা দেবী লেখাকে সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গায় নিয়ে গেছেন। তার উপন্যাস বেশিরভাগই সময়ের দলিল হয়ে পৌঁছে যাবে ভবিষ্যতের দিকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় অরণ্যের অধিকার উপন্যাসটি। এ ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা গ্রন্থটির ভূমিকায় বলেছেন— এ উপন্যাস রচনায় সুরেশ সিং রচিত Dust storm and Hanging mist বইটির কাছে আমি সবিশেষ ঋণী। সুলিখিত তথ্যপূর্ণ গ্রন্থটি ছাড়া বর্তমান উপন্যাস রচনা সম্ভব হতো না। সুরেশ সিং-এর বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। মহাশ্বেতা তার অরণ্যের অধিকার রচনা প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। কিন্তু সুরেশ সিং-এর বই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে। Birsa Munda and

His Movement-১৮৭৪-১৯০১ নামে। ইতিহাস-গবেষণা ও উপন্যাস রচনার এমন পারস্পরিক সমন্বয় খুব একটা ঘটে না। এ থেকে বলা যায় যে, মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাস থেকে এমন চরিত্র নির্মাণ করেন, যা নিজেই ইতিহাস হয়ে যায়।

মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী উপন্যাসে লোকজনের মুখে মুখে ঘুরেফেরা ভাষার অনবদ্য ব্যবহার করেন, তা চমৎকারভাবে চলতি বাংলার সঙ্গে অঞ্চলিক শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে। তার উপন্যাসের ভাষায় কাব্যিক বাহুল্য পূর্ণ নয়। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিমিতি বোধ লক্ষণীয়। উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী ভূমিলগ্ন-আদিবাসীর জীবন আখ্যানকে এমনভাবে তুলে এনেছেন যা মূলত হাজার বছরের ভারতীয় প্রান্তিক আদিমজনের জীবন-সংস্কৃতিরই সাক্ষ্যবাহী। যা বাংলা উপন্যাসকেও নতুন আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছে। গত কয়েক বছর ধরেই সাহিত্যে নোবেল প্রাপ্তির লিস্টে ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। গত ২৮ জুলাই তিনি মারা যান। তাঁর মতো সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবেন।

তথ্য সূত্রঃ

ইন্টারনেট